আমার শিল্পীসত্তায় রামকিঙ্কর

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

।।এক ।।

আমাদের আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। কলকাতায় আসি দেশভাগের অনেক আগে,, সেই ১৯৩৩ -এ। থাকতাম শোভাবাজার - বেনেটোলা অঞ্চলে। এক পাড়ায় নয়, নানান জায়গায়।

ছোটোবেলা থেকেই আঁকার দিয়ে ঝোঁক। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আঁকাজোকার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেসব আমারকিছুই ছিল না। শুধু ঝোঁক সম্বল করেই তো এগিয়ে যাওয়া যায়না ফাইন আর্টস -এর দিকে, অথচ একটা দিকে এখন আমায় যেতেই হবে। বয়েস যে আঠারো হয়ে গেল। ইচ্ছে থাকলেও ফাইন আর্টস নিয়ে পড়াশোনার কথা ভাবতেপারিনা অন্য একটি কারণেও, পশ্চিমবঙ্গে চাকরির বাজারে আর্টিস্টদের এখন কোন দাম নেই।

আমাদের ছিল বড় সংসার। নিজেরা সাত আটটি, আর জ্যাঠতুতো - পিসতুতো মিলে আরো দু-তিনটি ভাই - বোন। রোজগেরে বলতে একমাত্র বাবাই। উনি কর্পোপেশন স্কুলে মাস্টারি করেন। আমাকে ঐ বয়সেই টিউশানি করতে হয়। যা সামান্য টাকা আসে, সংসারে সাহায্য করি। আর্ট স্কুলে পড়াশোনা করতে খরচও অনেক। তাই ফাইন আর্টস নিয়ে পড়ব একথা বাবার কাছে বলার জো ছিলনা। আর্টিস্ট হওয়া ছিল আমার কাছে তখন সত্যিই বামন হয়ে চাঁদ ধরার সামিল।

মনের এই দোলাচলে দুলতে দুলতে তবু কোন অমোঘ আকর্ষণে জানি না, চৌরঙ্গিতে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে একদিন গিয়ে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে এলাম। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল ।আর কিছু না হোক নিজের এলেম তো যাচাই হয়ে যাবে।

শোভাবাজার বেনেটোলা অঞ্চলে এখনো বেনেরাই মূলত বাস করেন। যখনকার কথা বলছি, সংখ্যায় তখন তাঁরা আরো বেশিই ছিলেন। বেনেরা ব্যবসাটা ভালোই বোঝেন। তাঁদের অনেকেরই চালকল - গমকল - তেলকলকিংবা মুদিদোকান ছিল। তাঁরা বাইরে ব্যবসা নিয়ে মসগুল থাকতেন, আর অন্দরমহলের মেয়েদের ধর্মেকর্মে ছিল মাত্রাতিরিক্ত মতি। আচার - বিচার মেনে চলতেন কঠোরভাবে। প্রকৃতিতে রক্ষণশীল এই মহিলাদের মন ছিল কিন্তু ভারী স্নেহপ্রবণ। পুরষোরাও মানুষ হিসাবে বেশ ভালোই। গান - বাজনা - শিল্পকলার কদর করতে জানতেন। পাড়ায় যেসব মেয়েরা সিনেমা বা মিনার্ভা - রঙমহল ইত্যাদি থিয়েটারে অভিনয় করতেন তাঁরাও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা ভালো সাঁতার কাটে, গান করে, ছবি আঁকে, খেলাধূলা করে, তাদের উৎসাহ দিতেন---অর্থ সাহায্য করতেন।

তবে তাঁদের একটা ব্যবহারে সেই বয়সে মনে বড় দাগা পেতাম। আমাদের বাঙাল বলে তাঁরা উপহাস করতেন। মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গলের খেলা বা যেকোন অছিলায় তাঁদের বিদ্রূপবান সহস্রধারায় বর্ষিত হত আমাদের ওপর। তখনকার কলকাতায় যেহেতু আমরা অঙ্গুলিমেয়ভাবেই সংখ্যালঘু ছিলাম, তাই নীরবে তাঁদের কটাক্ষ আমাদের হজম করে যেতে হত।

পল্লির এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুটি ছেলেমেয়েকে পড়াতাম। টিনের চালের বাড়ি। দুই ভাই। দুই বউ। বড় বউয়েরই দুটি ছেলেমেয়েকে আমাকে পড়াতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ফাঁকে ছোট বউ এসে চা দিয়ে যান। কথা বেশি বলেন না, তবু টের পাই আমার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর আছে। এমনকি, আমার যে আঁকাজোকার ব্যাপারে কিছুটা আকর্ষণ আছে. ত

াও তাঁর অজানা নয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পড়াতে কবে যেন খাতার ওপর আনমনে একটা ছবি এঁকে ফেলেছিলাম, চা-দিতে এসে আমার আঁকা সেই ছবিটি কীভাবে যেন তিনি দেখে ফেলেছিলেন।

ছোট বউটির বয়স আমার থেকে কিছু কমই হবে। সব সময়ে নিজেকে আড়াল করে চলতেন। কোন এক রহস্যের জালে যেন ঘেরা। ওঁকে আমি ঠিকঠিক বুঝতে পারতামনা। তুলনায় বড়বউটি ছিলেন বেশ সাদাসিধে। কোনদিন নিজেই চায়ের ক াপ হাতে হাজির। বলেন, এই নাও চা, 'ছোট জা নিজের হাতে বানিয়েছে।' আর একদিন চা দিতে এসে বললেন, 'তুমি বাব া আঁকা নিয়ে পড়াশোনা করো, ছোটজা বলছিল।'

অন্য আর একদিন আমার ছাত্রীটি একটা সাদা টেবিলক্লথ আমার সামনে মেলে ধরে বলে, 'এর ওপর একটা নকশা এঁকে দাও, কাকিমা বলছিলেন।'

শুনে আমি তাজ্জব। আমি কি কলেজে পাশকরা পাকা আর্টিস্ট যে বলামাত্র নকশা এঁকে দেব ? কিন্তু আমার বয়সটাই তখন এমন যে সহজে কারো কাছে হার মানতে চায় না। যেমন মনে এল, পেন্সিল দিয়ে টেবিলক্লথের ওপর একটা নকশা এঁকে দিলাম। পরে অবশ্য ছোট বউয়ের সুন্দর সুচিশিল্পের ছোঁয়ার নকশি টেবিক্লথটি অপরূপ হয়ে উঠেছিল।

ওদিকে, গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলের বোর্ডে অ্যাডমিশন টেস্টে উত্তীর্ণ ছাত্রদের একটা তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ত ালিকায় দেখি এই অধমের নামও রয়েছে।

লিস্টে নাম থাকার কারণে স্বভাবতই আমি খুশি। চিন্তা অন্যখানে, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পথে বিস্তর বাধা। যাওয়া - আসা ন া হয় পদব্রজেই সারা হল, কিন্তু ভর্তি হতে গেলেই যে চব্বিশটাকা দশ আনা অ্যাডমিশন-ফি চাই সে টাকা কোথা থেকে পাব? বাবার কাছে চাইবার সাহস নেই। নিজেও যে ম্যানেজ করব তেমন রাস্তা নেই পকেটের।

অগত্যা মনের সাধ মনেই লুকিয়ে রাখি।

যথারীতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছি, বড়বউ একদিন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এসে বললেন, 'তোমাকে যে আঁকার স্কুলে ভর্তি হতে বসেছিলাম বাবা তার কি হল? ছোটজা জানতে চাইছিল।' আমি বড়বউকে তখন খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম, 'দেখুন আমি আর্টস্কুলে ভর্তি হবার জন্য অ্যাডমিশন টেস্টের পবীক্ষা দিয়েছিলাম। তাতে পাশও করেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভর্তি হতে গেলে অ্যাডমিশন-ফি লাগবে চব্বিশ টাকা দশ আনা। সেটাকা জোগাড় করা এখুনি আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা।'

আমার কথা শোনার পর বড়বউ একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিলেন, তারপর স্নেহভরা গলায় বললেন, 'যদি কিছু মনে না করো তবে একটা কথা বলি।'

আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানাই, 'বলুন না কি বলবেন?'

---'দ্যাখ বাপু, এখন আমিই না হয়ে তোমাকে চব্বিশ টাকা ধার দিচ্ছি, স্কুলে ভর্তি হয়ে তোমার সুবিধেমত না হয় কিস্তিতে কিস্তিতে ও-টাকা তুমি শোধ করে দিও। ছোটজা বলছিল, তোমার আঁকার স্কুলে নাকি এখনই ভর্তি হওয়া দরকার।'

আমার আর কোন ওজর খাটলনা। ১৯৪৮-এ সুবোধ বালকের মত গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম তথাপি বাধা-বিঘ্ন আমার পিছু ছাড়লনা। শুতেই গণ্ডগোল। সারা দেশ তখন চটকল ধর্মঘট নিয়ে উত্তাল। শ্রমিকদের পাশে থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। দেশবাসীর সঙ্গে ছাত্ররাও সে আন্দোলনে সামিল। আর্টস্কুলেও লেগেছে সে-অ ান্দোলনের আঁচ। আমাদের স্কুলের ছাত্রনেতা ছিলেন তখন এখনকার বিখ্যাত শিল্পী- ভাস্কর সোমনাথ হোর। উনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের সিনিয়ার ছিলেন।

কর্মজীবনের শেষদিকে সাময়িকভাবে মাত্র তিন মাসের জন্য আর্টস্কুলের নির্বাহী প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন সতীশ সিংহ। উনি অবসর গ্রহণ করার পর আর্টস্কুলে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন সদ্য প্যারিস - ফেরৎ শান্তিনিকেতন কলাভবনের রমেন্দ্রনাথ চত্রবর্তী। উনি একজন বড় শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিলেন বোধহয় শিল্পবোদ্ধা।ওঁর অদ্ভুত গুণ ছিল যে আঁকা দেখলেই বুঝে নিতে পারতেন কার ভেতরে সম্ভাবনা আছে, কার নেই। এখন নির্দ্বিধায়ক বুল করছি, ছাত্রাবস্থায় একটা সময় আর্টস্কুলে পড়াশোনা করার ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে হতাশ মনে ভেবেছিলাম স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দেব। সেইসব দুর্যোগের দিনে উনি পাশে থেকে অভয়বাণী শুনিয়েছেন, 'এত সহজে ভেঙে পড়োনা, তোমার মধ্যে সম্ভাবনা অ াছে।'

রমেন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। কোন ছাত্র যখন কিছু আঁকছে, নানা ব্যস্ততার মধ্যেও

তিনি তার পাশে এসে দাঁড়াতেন। প্রথমে হয়তো উৎসাহ দেবার জন্য বলতেন, 'বাঃ বেশ হয়েছে,' তারপর ছবিটা দেখিয়ে বলতেন, 'এই লাইনটা তুলে দিলে কেমন হয় ? ছবির ঐ জায়গাটায় অমন করলে কেমন দাঁড়ায় ?'
ছবির দোষ-ত্রটিগুলি ধরতে পেরে ছাত্রটির তখন চোখ খুলে যেত।

রমেন্দ্রনাথ ছিলেন কলাভবনে নন্দলাল বসুর হাতে গড়া ছাত্র। নন্দলাল পাশ্চাত্যরীতির শিল্পকলার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। শিষ্যটি কিন্তু তেমন নয়। শেষের দিকে লন্ডনে গিয়ে শ্রুতকীর্তি রিয়ালিস্টিক পেন্টার মুরহেড বুনের সহযোগীর রূপে ছবি আঁকা শিখেছিলেন।

ছাত্র হিসেবে রমেন্দ্রনাথ খুবই কৃতী ছিলেন। ড্রায়িংয়ে ওঁর হাত খুব পাকা, আর স্কেচ আঁকায়ও জুড়ি মেলা ভার। অতএব অচিরেই উনি মুরহেড বুনের সহযোগীরূপে ছবি আঁকা শিখেছিলেন।

ছাত্র হিসেবে রমেন্দ্রনাথ খুবই কৃতী ছিলেন। ড্রয়িংয়ে ওঁর হাত খুব পাকা, আর স্কেচ আঁকায়ও জুড়ি মেলা ভার। অতএব অচিরেই উনি মুরহেড বুনের প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলেন।

প্রশাসকরূপেও রমেন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয়। একদিকে একরোখা জেদি, অন্যদিকে ছাত্রদরদী--- স্নেহপ্রবণ। কাজের লোক বলে ওঁর খ্যাতি।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের শিল্পকলা জগতের একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং সেই পরিবর্তনের মূল কাণ্ডারী ছিলেন রমেন্দ্রনাথ। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে তিনিই সর্বপ্রথম দিল্লিতে আর্টকলেজ স্থাপন করেন। এর আগে ওখানে পলিটেকনিক কলেজ ছিল, আর্ট কলেজ ছিলনা। বৃটিশ আমলে লক্ষ্মৌতে একটা আর্ট স্কুল ছিল নামকো আস্তে, ছিল মুম্বাইয়ে জে.জে স্কুল অব আর্ট। কিন্তু ওগুলো ছিল নেহাতই ছকে - বাঁধা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত আর্টের ভেতর যে একটা রিভলিউশন লুকিয়ে আছে সেটা প্রথমে এদেশে আনেন রমেন্দ্রনাথই।

কলকাতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ সচিব রূপে রমেন্দ্রনাথেব ভূমিকা ভোলবার নয়। লেডি রানু মুখার্জি অ্যাকাডেমির কাজে শুতেই সচিব হিসেবে নিয়ে আসেন রমেন্দ্রনাথকে। এর অনেক আগেই, সেই, ১৯৩৩ -এই অবশ্য অ্যাকাডেমির কাজ শু হয়েছিল। তখন ওখানকার বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীগুলি অনুষ্ঠিত হত কলকাতার জাদুঘর বা ঐ - ধরনের আরও কোন কোন জায়গায়। তখনকার বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীতে ১৯৩৬ থেকে ৪৬ পর্যন্ত টানা এগারো বার প্রথম পুরস্কারের স্বর্ণপদক লাভের দুর্লভ কৃতিত্ব ছিল আমাদের গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলেরই আর এক মাস্টারমশাই মাখনলালর দত্তগুপ্তর। মাখনলাল ছিলেন এক মস্ত বড় শিল্পী। ওঁর কাজ দেখে পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপনসংস্থা ডি. জে. কি মারের দিলীপ গুপ্ত --- যিনি সাধারণ্যে ডিকে নামেই সুপরিচিত--- ডেকে এনে ওঁকে চাকরি দেন ডি. জে. কিমারে।

অ্যাকাডেমির ক্যাথিড্রাল রোডের বর্তমান ভবনে বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১৯৬০-এ নন্দলাল বসুর পঞ্চাশটি ছবি নিয়ে। রমেন্দ্রনাথ অ্যাকাডেমির সচিব থাকাকালীন ওখানে চিত্র প্রদর্শনীতে বিচারকরূপে আনতেপেরেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের স্বনামধন্য কলাবিশেষজ্ঞ ও শিল্পীকে। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে, সেসব বিচারকের নিরপেক্ষ বিচারের ফলে অ্যাকাডেমি চিত্র প্রদর্শনী সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা লাভ করতে পেরেছিল। ও.সি.গাঙ্গুলির মতশিল্প-সমালোচক আমাদের ছবির বিচারকের ভূমিকা পালন করছেন--- ভাবা যায় ?

তখনকার দিনে অ্যাকাডেমি বা অন্য কোন চিত্রপ্রদর্শণীতে ছাত্রশিল্পীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারত না। নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাস্টারমশাইরা ছবি দেখে আগে যোগ্য বলে অনুমোদন করলে তবেই তা প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেত। আমাদের গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলে ছাত্রদের কাজ ঝাড়াই - বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ। রমেন্দ্রনাথ স্বভাবতই ছাত্রদের শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত থাকতে চাইতেন, তাদের পাশে থেকে পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

এই ধরনের ঝাড়াই - বাছাইয়ের ফলে অ্যাকাডেমি বা অন্যান্য চিত্র-প্রদর্শনীতে ছাত্রশিল্পীদের যোগদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠত, প্রদর্শনী সঠিকভাবে গণ্য হত উন্নত মানের । প্রধান কৃতী শিল্পীরা যারা সরাসরি এই ধরনের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য ছাড়পত্র লাভ করতেন তাঁদের যোগ্যতা ছিল প্রাতীত। নন্দলাল বসু ছাড়া এই তালিকায় ছিলেন ভবেশ সান্যাল, লক্ষ্মৌয়ের সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ। এইসব নক্ষত্র শিল্পীদের পাশাপাশি আমার মত অখ্যাতনামা এক ছাত্রশিল্পীর ছবি পতর্শিত হয়েছে ভাবলে এখনো মনে রোমাঞ্চ অনুভব করি। অ্যাকাডেমি চিত্রপ্রদর্শনীর শু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পর্ব নখদর্পণের মত স্পষ্ট ছিল রমেন্দ্রনাথের কাছে।

আবার একটু পিছু ফিরে যাই। চটকল - ধর্মঘট চলাকালীন আমাদের আর্টস্কুলে একদিন রমেন্দ্রনাথ আমাদের স্কুলের ছেলেদের সবাইকে ডেকে বললেন, 'যদি তোমরা চটকল শ্রমিকদের সমর্থনে এখানে স্ট্রাইক কর তবে সবাইকে সাসপেণ্ড করব। তোমাদের নিজেদের যদি কোন সমস্যা থাকে--- যেমন ন্যুড স্টাডি, মডেল ইত্যাদি সংক্রান্ত---আমাকে বল, আমি স
াধ্যমত প্রতিকার করে দেব। কিন্তু স্কুলের কাজে ফাঁকি দিয়ে স্ট্রাইকে মাতলে, তোমাদের ভোগান্তি আছে।'

স্টাইক শু হয়ে গেল। আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা তখনও পরস্পর তেমন পরিচিত হয়ে উঠিনি। স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ কারণে বিজন চৌধুরি প্রমুখ ছজন ছাত্র সাসপেন্ড হলেন। আমি স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে আমাকে জানালেন, 'স্কুলে ঢুকতে চাও তো তোমায় বন্ড দিয়ে ঢুকতে হবে।'

আমি স্কুলে গেলাম না, এমনকি চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলাম না। প্রিন্সিপালের হুমকির কাছে নত হওয়া আমার রক্তে ছিলনা। এ-সময় আরো কয়েকটা বাড়তি টিউশানি নিই, নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে রাখার জন্য। তবু মনে খিচখিচ করে অশা
ন্তি। অশান্তি কাটানোর জন্যো অদূরবর্তী গঙ্গার ঘাটে বসে বাঁশিতে সুরের মায়াজাল রচনা করি। মনে শান্তি আসে।

এইসব টালমাটাল সময়ে একদিন বাইরে থেকে ঘরে ফিরে দেখি আমাদের দীনভবনে বাবাকে নিয়ে তক্তাপোষে বসে অ
াছেন প্রিন্সিপাল রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমি জানতাম উনি আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না, তবে কেন তাঁর আগমন? সিদ্ধ
ান্ত নিই, পদধূলি দিয়েছেন যখন, ওঁকে একটা প্রণাম করা যাক।

আমি প্রণাম সারতেই, উনি আমার বাবাকে অভিমানী গলায় শুধান, 'আপনার ছেলেকে আর স্কুলে দেখিনা কেন?'

বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি জানাই, 'স্যর আমি আর কোনদিনই স্কুলে যাবনা।'

উনি আমার জবাব শুনে একটুও ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং নরম গলায় স্নেহ মাখিয়ে বললেন, 'বাবুর দেখছি রাগ এখনো য
ায়নি। আচ্ছা বাপু, তোমার বাবাও তো তোমাকে কখনো কখনো বকাবকি করেন-- করেন কিনা? রাগ মনে পুষে রেখোনা, আবার স্কুলে ফিরে এসো।'

আমি আবারো ওঁকে বলি, 'স্কুলে ফিরে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। অনেকগুলো টিউশানি নিয়ে ফেলেছি, সেগুলি সামলে স্কুলের সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবনা।'

বাবাকে নমস্কার জানিয়ে এক সময় রমেন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন। ওঁর সম্পর্কে আমার মনের বিদ্বেষ অনেকটাই কেটে গেল। কিছুটা হালকা বোধ করলাম, যদিও স্কুলে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন হলনা।

আরো কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। অমি আর্টস্কুলের দোর মাড়াচ্ছিনা, চুটিয়ে টিউশানি করে চলেছি। এমনই একদিনে অগ্রজ শিল্পী নির্মল দত্ত আমার বাসায় এলেন। তাঁরও সেই একই প্রশ্ন স্কুলে যাচ্ছিনা কেন, বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়েছি কিনা, এবং তারপর যথারীতি উপদেশ, আমি যেন অবিলম্বে স্কুলে জয়েন করি।

নির্মলদা স্কুলে সিনিয়ার ছাত্র। মামুলি সৌজন্যমূলক কথা তিনি আমায় বলেননি। আমার বিপদে সত্যিকারদাদার মতই সর্বদা পাশে থেকেছেন। আমার শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে ওঁর আবেদনের কথা আমি কোনদিন ভুলবনা। বিভিন্ন জায়গায় স্কেচ আঁকার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। স্টাডিতে বা স্কেচ আঁকায় যে সিনিয়ার ছাত্ররা আমাদের সঙ্গে থাকতেন তঁ
ারা এক অর্থে আমাদের শিক্ষকই। ভুলচুক হলে ধরিয়ে দিতেন, আঁকার পথ বাতলে দিতেন।নির্মলদা এসব দায়িত্ব তো অবশ্যই পালন করতেন, তদুপরি বড় ভাইয়ের মত আমাকে সব সময় আগলে রাখতেন। আমার সে-সময় এমনই দুরবস্থা যে বাড়িতে ছবি আঁকার মত কোনো পরিবেশ নেই। নির্মলদা আমার সমস্যার কথা জেনে সঙ্গে সঙ্গেনিয়ে গেলেন জয় মিত্র স্ট্রিটের এক বেনেবাড়ি--- কুঞ্জ কুটিরে। ঐ বাড়ির মেয়ে নীলিমা দে আমাদেরস্কুলেই পড়তেন। ওঁদের বাড়িতে একতলায় বিরাট নাচঘর। সাবেকি আসবাব, ঝাড়লন্ঠন। অঢেল জায়গা। সেখানেই আমার আঁকাজোকার ব্যবস্থা করে দিলেন । অ
ামার তো বটেই, আমার কাছে যেসব বন্ধু আসত তাদের জন্যও ঢালাও জলযোগের ব্যবস্থা--- লুচি, কুমড়োর ছক্কা, আরে
া কত কি। আর চায়ের তো কোন বিরাম ছিল না।

দে-বাড়ি সুরসিকও বটে। তাঁদের বাড়িতে তখন নিয়মিত আড্ডা দিতে আসতেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,অমল হোম, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ বিদ্বজ্জন, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল পাল প্রমুখ শিল্পী, আর শান্তি পালের মত সাঁতারা।

দে-বাড়ির বাখানি বরং থাক, কথা হচ্ছিল নির্মলদাকে নিয়ে। উনিও অনতিদূরস্থ দর্জিপাড়ার সম্ভ্রান্ত দত্তবাড়ির ছেলে। পরবর্তীকালে নীলিমা দের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। দুজনেই শিল্পী। এমন মণিকাঞ্চন যোগ বড় একটা দেখা যায় না।

এ হেন নির্মলদার অনুরোধ ঠেকানো আমার পক্ষে সম্ভব হলনা। আমাকে আবার আর্ট স্কুলে ফিরে যেতেই হল।
কোর্স কমপ্লিট করতে পারবনা আমার এ আশঙ্কা আমি নিজেই ভুল প্রমাণ করে দিলাম।
দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে পাঁচটা বছর কেটে গেল। ১৯৫৩-য় শেষ পরীক্ষার ফল যখন বেরোল তখন দেখা গেল কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগে আমি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। ততদিনে অবশ্য গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল আর্ট কলেজে নামান্তরিত হয়েছে (১৯৫১-য় স্কুল নাম ঘুচিয়ে সংস্থাটি কলেজে রূপান্তরিত হয়)।
গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রথম শ্রেণি পেলে কি হবে, আমার উপযুক্ত কাজ কই? খবরকাগজ দেখে রাশিরাশি দরখাস্ত করি। কোনটার জবাব আসে, কোনটার জবাব আসে না। বরাত ভালো, এ-সময় আমার ব্যাঙ্কের চাকুরে এক টাইপিস্ট বন্ধু ছিল। তার কাছে গেলে, সে আমার আবেদনপত্র শুধু যে বিনিপয়সায় টাইপ করে দিত তাই নয়, চা- টোস্টও খাওয়াত। কোথাও কোন সাড়া না পেয়ে আমি যখন হতাশ হয়ে পড়তাম সে তখন আমাকে সাহস জুগিয়ে বলত, 'দরখাস্ত করে যা, কোথায় কখন লেগে যায়, বলা তো যায় না'
তখন আমার পরিবারের হাল এমনই যে পছন্দসই চাকরির জন্য সবুর করা সম্ভব নয়। অগত্যা কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে একটা শিক্ষকতার চাকরি জুটিয়ে নিলাম। সকালের স্কুলে, মাস - মাইনে নববই টাকা। তার থেকে মায়ের হাতে তুলে দিতাম ষাট টাকা।
সকালের স্কুলে কাজ সেরে হাতে অনেকটা সময় পাওয়া যেত। সময়টা কিভাবে কাজে লাগাই? তিন বন্ধুতে মিলে ধর্মতলা স্ট্রিটের ওপর একটা স্টুডিও খুলে বসি। উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য - সংস্থার অ্যাডের কাজ করে বাকি সময়টুকু শিল্পচর্চায় মগ্ন থাকব। বাণিজ্য - সংস্থা থেকে টাকাও উপার্জন করা যাবে, আবার শুদ্ধ শিল্পচর্চাও করা যাবে। আমরা তিনবন্ধু অজিত চক্রবর্তী (যিনি পরবর্তীকালে কলা ভবনের প্রিন্সিপাল হন), রমেন্দ্রনাথ কুণ্ডু এবং আমি অমরেন্দ্রলাল চৌধুরি--- আমাদের তিন জনের নামের আদ্যক্ষ মিলে সংস্থার নামকরণ করা হল 'আরা'।
বাইরের ঠাট - বাট সব ঠিকই ঠিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলনা। অচিরেই আমাদের সাধের 'আরা' উঠে গেল।
মনে এক ধরনের গ্লানির সঞ্চার হল। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রথম শ্রেণি পাওয়া একজন স্নাতকের কিনা শেষে নববই টাকা মাস মাইনের কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতে হচেছ? আবার সান্ত্বনা খুঁজে পাই মনে এই ভেবে, শুধু আমিই তো নয়--- দেবকুমার রায়চৌধুরি, নির্মল দত্তর মত অগ্রজ শিল্পী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মত সাহিত্যিক, সাগর সেনের মত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীও তো এই কাজ করতে বাধ্য হচেছন। আসলে তখন পশ্চিমবঙ্গে আর্ট নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, সাহিত্য-সংগীতে যারা পারদর্শী, তাদের চাকরির হাল এমনই সঙ্গিন ছিল।
কর্পোরেশন স্কুলে চাকরি করাকালীন সহকর্মী বন্ধুরা মিলে এডুকেশন অফিসার ড. অরবিন্দ বয়ার কাছে যেতাম। খুব উদার মনের লোক ছিলেন উনি। উনি জানতেন আমরা পেটের দায়ে কর্পোরেশন স্কুলে কাজ করছি বটে ভালো সুযোগ পেলেই কাজ ছেড়ে দেব। তা ওঁর সংকলন ছিল কে শিল্পী হয়েও ভালো কাজ পাচেছনা, কে কবি হয়েও নাম করতে পারছেনা, কে গাইয়ে হয়েও নিজেকে ঠিকমত তুলে ধরতে পারছেনা--- তাদের ঠিকমত সাহায্য করা। বড়ুয়া সাহেবের মত মানুষ হয়তো এখনো আছেন। তবে এখন তাঁদের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে হবে।
এক সময় শুনি, কংড়া এস.ডি.পি. টেকনিকাল ইনস্টিটিউটে শিল্পকলা বিভাগে শূন্যপদে লোক নেওয়া হচেছ। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে দিই। লাগলে কেল্লা ফতে।
অচিরেই ইন্টারভিউর কল পেয়ে গেলাম। চিঠিটা হাতে পেয়ে কিন্তু ধন্দে পড়ে যাই। কাংড়ায় যাওয়া মানে তো একটা নতুন এস্টাবলিশমেন্ট। কত মাইনে দেবে, কে জানে। কলকাতার মায়া আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, কফি হাউস--সবকিছুরই গঙ্গাপ্রাপ্তি। আমি ভেবে কূল পাইনা।
মনের এই দোটানা অবস্থা দেখে আমার কলেজের এক অধ্যাপক প্রদোষ দাশগুপ্ত--- যিনি আমার হাঁড়ির হাল জানতেন, বলেন, 'যাবেনা মানে? তোমাকে কাংড়ায় যেতেই হবে।'
উনি আমার মাস্টারমশাই বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ গু ছিলেননা। উনি ছিলেন ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান, আর আমি ছিলাম কর্মাশিয়াল আর্ট বিভাগের ছাত্র। তখন যদিও ভাস্কর্য বিভাগ বা কর্মাশিংয়াল বিভাগ নামে কোন স্বতন্ত্র বিভাগের জন্ম হয়নি আমাদের কলেজে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করার যে তখনকার মাস্টারমশাইরা কত ছাত্রদরদী ছিলেন। আমি আর্টস্কুলে পড়তে যাচ্ছিনা, স্বয়ং প্রিন্সিপাল রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার বাড়ি হাজির হয়ে গেলেন। চাকরিতে কাংড়া যেতে ইতস্তত করছি, ভাস্কর্যের বিভাগীয় প্রধান প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁর বিভাগের লক্ষ্মণরেখা পার হয়ে আপনজনের মত আমাকে ভর্ৎসনা করছেন।

।। দুই ।।

আমাকে কাংড়া ইন্টারভিউতে যেতেই হল। এক বন্ধু গলার টাই দিয়ে বলল, 'ইন্টারভিউর সময় কাজে লাগবে।' আমি তখন এমন আকাট ছিলাম যে টাই পরার কায়দাকানুনই জানিনা।

বয়স তখন সবে সাতশ। আগে কখনো কাংড়ায় যাইনি। জায়গাটা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। বইয়েই পড়েছি শুধু ক াংড়া ভ্যালির কথা। কাংড়ার ধ্রুপদী চিত্রকলাও দেখেছি বইয়ের পাতায়। কলকাতা ছাড়ার আগের রাতেস্বপ্নে দেখলাম প াহাড়তলির এক শান্তস্নিগ্ধ জনপদের ছবি। আমার স্বপ্নের জনপদ কি এখানে? পাঠানকোট থেকেও কয়েকশো মাইল দূর। জায়গাটা এখানকার পাহাড়ি প্রদেশ হিমাচলে।

কী আশ্চর্য, যখন সত্যিই কাংড়ায় বৈজনাথে পৌঁছলাম তখন দেখি আমার স্বপ্নের জনপদটির সঙ্গে বাস্তবের কাংড়ার কী দ ান মিল। সবুজ গাছ-গাছালিতে ভরা এক নিরিবিলি পাহাড়ি পরিবেশ।

কাংড়া এস.ডি.পি. টেকনিকাল ইনস্টিটিউটে ইন্টারভিউর প্রশ্নগুলো ছিল ভারী সুন্দব। আমি জবাবও দিয়েছিলাম ভালো। অনেক প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের যোগ্যতাও হয়তো কিছু কমতি ছিল না। তবু কেন জানিনা আমার মনে হচ্ছিল চাকরিটা আম ার জন্যই অপেক্ষা করছে---শুধু আমারই জন্য! মনের গোপন বাসনা মনের মধ্যেই লুকিয়ে রেখে ভাবি, এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে যখন কাংড়ায় এলামই, তখন এখানকার নিসর্গের মনোরম কিছু দৃশ্য রেখায় - পটে বন্দি করে ফেলি। রঙ - তুলি নিয়ে বসে গেলাম আঁকতে।

আঁকা শেষ করে বৈজনাথের ডাকবাংলো থেকে ফিরছি, হেঁড়ে গলায় শুনতে পাই কে যেন রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে চলেছেন   সে আমার মনে নাই মনে রবে কিনা রবে আমারে।

সঙ্গে টর্চ ছিল। জ্বালতেই , এদিক থেকে একটা হুংকার শোনা গেল, 'কে রে তুই ওখানে ?'

আমি থতমত খেয়ে জানাই, 'আমার নাম শ্রীঅমরেন্দ্রলাল চৌধুরি--- কলকাতা থেকে এখানে একটা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম।'

আমার জবাব শুনে লোকটা মাঠ - কাঁপানো হো - হো হাসি হাসতে লাগলেন। ছোটো চুল, খর্বকায়। হাতের আঙ্গুলের গড়ন চৌকোপনা, নখ যেন কাছিমের পিঠ। দৈত্যের মত চেহারা।

আমাকে পাশে বসিয়ে লোকটা ভারিক্কি মেজাজে বলতে লাগলেন, 'ও বুঝেছি। তুমি যে পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছো, সেখানে আগে ছিল আমারই এক প্রিয় ছাত্র। আগে আমিও কিছুকাল ও পোস্টে কাজ করেছি। সে কথা থাক, আমার ছ াত্রটির কথাই বলি। ওছোঁড়া দিনরাত মদের নেশায় ডুবে থাকত বলে কর্তৃপক্ষ ওকে স্যাক করে দিয়েছে। আমি তো এসব কিছুই জানতাম না, এখানে এসেই প্রথম শুনি।'

লোকটার চেহারার গড়ন, কথা বলার ধরন এবং সর্বোপরি বক্তব্য শুনে বুঝতে অসুবিধা হয়না যাঁর সঙ্গে এতক্ষন কথা বলছি তিনি স্বনামধন্য শিল্পী - ভাস্কর রামকিঙ্কর বেজ।

শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু আজ আর বলতে লজ্জা নেই, শান্তিনিকেতনের নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখো াপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ঘিরে মনে প্রচণ্ড কৌতূহল থাকলেও, কখনো চাক্ষুষ করার সুযোগ অ াসেনি আমার জীবনে। তখন শান্তিনিকেতন গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করার মত অর্থ-সামর্থ্যও আমার ছিল না। ওঁরা তখন নিশ্চয় কখনো - সখনো কলকাতায় আসতেন, কিন্তু টিউশানিতে মসগুল্ আমি ওঁদের কোন খবরাখবররই রাখতামন া। অন্যান্য সহপাঠীদের মুখ থেকে গল্প শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতাম। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র ছিলেন আম াদের কলেজের প্রিন্সিপাল রমেন্দ্রনাথ চক্রবতী। তাঁর মুখ থেকেও নানা প্রসঙ্গে ওঁদের কথা শুনেছি।

প্রিয় ছাত্র - প্রসঙ্গে রামকিঙ্করের বক্তব্যে সহানুভূতিভরা আক্ষেপ লুকিয়েছিল. ছাত্রটির স্যাক হওয়ার ঘটনাটি উনি খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেননি। কেউ বা পারে।

আমি নির্বাক শ্রোতা। আমাকে পাশে বসিয়ে উনিই এক নাগাড়ে কথা বলতে লাগলেন, যার সারমর্ম হল   দিল্লিতে রিজ

ার্ভ ব্যাঙ্ক তখন তৈরি হচ্ছে। ওখানে যক্ষ-যক্ষিণীর একটি মূর্তি স্থাপন করা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন জহরলাল নেহে। তিনি মূর্তি নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন রামকিঙ্কর বেজের ওপর। কোন এক্সপার্ট ওপিনিয়নের দরকার মনে করলেন না, কোন রকম টেন্ডার কলও হল না। একেবারে সরাসরি নিয়োগপত্র পেয়ে গেলেন রামকিঙ্কর। পাক্কা জহুরি ছিলেন জহরল াল। উনি রামকিঙ্করকে ডেকে বললেন, ‘মূর্তি নির্মাণে যা পাথর লাগবে তা আমিই আনিয়ে দিচ্ছি, তুমি কাজে লেগে য াও।’

জহরলালের মুখের ওপর রামকিঙ্কর বলে দিলেন, ‘না, না, ওটি হচ্ছে না। মূর্তি নির্মাণের পাথর আমি নিজেই সংগ্রহ করে নেবো। কাংড়া ভ্যালিতে পাহাড় আছে। পাহাড় ব্লাস্ট করে পাথর কাটতে হবে। আট কিউবিক ফুট করে ছটা পাথর ল াগবে।’

জহরলাল আপত্তি তো করলেন না-ই, বরং তৎক্ষণাৎ পাথর কাটার খরচ বাবদ আগাম পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করে দিলেন। সেই টাকা হাতে নিয়েই রামকিঙ্কর কাংড়ায় এসেছেন।

ওদিকে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি জেনে যাই যে ইন্টারভিউতে আমিই সফল হয়েছি। পাঞ্জাব-তনয় ওয়াই.পি.মায়ার ছিলেন এস.ডি.পি. টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের সর্বাধ্যক্ষ। উনি বেনারস ইউনিভারসিটির এঞ্জিনিয়ার। আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব আমার আগে সাময়িকভাবে উনিই সামলাতেন, ওঁর নিজের কাজের সঙ্গে। উনিই আমাকে প্রথম জানান, তুমি আর্ট সেকশনের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট মনোনীত হয়েছো।

আমি জানাই, হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের কাজ তো প্রশাসনিক। আমি আর্টিস্ট, ছবি আঁকাই আমার কাজ। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তো আমার মোটেই নেই।

মায়ারজি সান্ত্বনা জানিয়ে আমায় বললেন, ঘাবড়াচ্ছো কেন ব্রাদার, তুমি যে একজন আর্টিস্ট তা আমার জানা আছে। অ ার্টিস্ট হলেই যে প্রশাসনিক কাজ করতে পারবে না এমন ভেবো না। কাজে লেগেই দেখ না, আমি তো মাথার ওপর আছি। আমি তথাপি নীরব। উনি ফের বলতে থাকেন, তোমার খাওয়া - পরার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তুমি তো বাঙালি, তোম ার মাছ - ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য একটা কাজের লোকও পাবে।

তবুও আমার দিক থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে মায়ারজি প্রসঙ্গ পাল্টে, জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ধুমপান করনা কেন?

এতক্ষণে আমার মুখে রা সরে। আমি বলি, মায়ারজি, আপনি বয়সেই শুধু পিতৃপ্রতিম নন, দেখতেও আমার বাবার মত। আপনার সামনে আমি ধুমপান করতে পারবনা।

যথা সময় আর্ট বিভাগের ডিপার্টমেন্টাল হেড হিসাবে কাজে যোগ দিই। মাইনে মাসে সাতশো পঞ্চাশ টাকা। আমার জন্য একটা কোয়ার্টার আর কাজের লোকও বরাদ্দ করা হয়েছে। সমস্যা একটাই, এই নির্বান্ধব পুরীতে বাংলা ভাষায় কথা বল ার মত লোক নেই।

দু-একদিনের মধ্যে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে ঐ প্রবাসে বাঙালির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। জুটেও যায় তাড়াতাড়ি।

দেশভাগের পর পাঞ্জাব সরকার জেলায় ডিপ্লোমা কোর্সের আর্ট কলেজ খুলেছে। সেসব কলেজে অধ্যাপনার কাজে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশই বাঙালি। তখন দেশজুড়েই একই চিত্র--- শিল্পকলা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক - প্রিন্সিপালেরা বেশিরভাগই বঙ্গসন্তান।

এমনই এক আর্ট কলেজের কাকলার অধ্যাপক ছিলেন গোপালচন্দ্র রায়। গোপালবাবুর দুই সুন্দরী শালিও তাঁর সঙ্গে থ াকতেন। বাইরে থেকে থেকে তাঁরা বাঙালিয়ানা ভুলতে বসেছিলেন, ভুলতে বসেছিলেন বঙ্গ সংস্কৃতিকেও। গোপালবাবুর শ্যালিকাদ্বয়ের মধ্যে বাঙালিয়ানার পুনর্জ্জীবনের মহান দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিলেন কাংড়ায় দু-দিনের জন্য পাথর ক াটতে - আসা শিল্পী কিঙ্করদা (রামকিঙ্কর বেজকে আমরা ওই নামেই ডাকতাম)। এ কাজে তাঁর সহায় হল রবীন্দ্রনাথের গ ান। উনি মনের আনন্দে গোপালচন্দ্রের সুন্দরী শ্যালিকা দুটিকে রবীন্দ্রসংগীত শেখাতে শু করে দিলেন। পাহাড় থেকে প াথর কাটার আয়োজনও পাশাপাশি চলতে থাকে।

একদিন শুনি আমাদের কলেজের দারোয়ানটিকে ডেকে তিনি হুকুম করে চলেছেন, মাটি লে আও, পানি লে আও, স াহেবকো বোলোও--- সে কী তাঁর লম্ফঝম্ফ। যেন একটা খাঁচা- ছাড়া বাঘ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার পরক্ষণেই দেখি সেই ক্ষিপ্ত বাঘটি মাটি মাখতে বসে গেছেন। প্রস্তাবিত যক্ষ-যক্ষিণীর ক্লে-মডেল করতে হবে না? এখন তাঁর অন্য মূর্তি । স

াধকের মগ্নতা।
আর একদিনের কথা। আমি ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে আউডোরে বেরিয়েছিলাম ছবি আঁকতে। ফিরে এসে দেখি আমার কোয় ার্টারের কাজের লোকটাকে কিঙ্করদা হুকুম দিচ্ছেন, যাও চারঠো অন্ডা লে আও, চা লে আও।
আমি পৌঁছলে, আমাকে দেখে উনি বলে উঠলেন, হুঁঃ ডিপার্টমেন্টাল হেড হয়েছেন না হাতি। ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।
লোকটার চাল-চলন-কথাবার্তার স্টাইলই ছিল এমন। কখন যে কোন মুডে থাকেন আগে থেকে বোঝা মুস্কিল।
আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। মফস্‌সল শহরে রাত দশটা-এগারোটা মানে মাঝরাত্রিই বলা যায়। অত রাতে আমার ঘরের বাইরে থেকে একটা সিংহগর্জন শোনা গেল, কি করছো হে শুয়ে শুয়ে? এসো, বাইরে বেরিয়ে এসো।
বেরিয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় মাঠঘাট ভেসে যাচ্ছে। আমাকে পাশে নিয়ে কিঙ্করদা উদাত্তকণ্ঠে গাইতে শু করে দিলেন, আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।
সামনে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পাকাদণ্ডির পথ। চতুর্দিকে পোলি আলোর ছড়াছড়ি। তার মধ্যে মধ্যরাতের স্তব্ধতা ভাঙিয়ে কিঙ্করদার গলার রবীন্দ্রসংগীত একটা অভাবনীয় সুন্দর পরিবেশ রচনা করল। এর আগে রবীন্দ্রসংগীতে আমার চি ছিল ন া। কেমন যেন একঘেয়ে প্যানপ্যানানি মনে হত। সেই প্রথম আমি রবীন্দ্রসংগীতের প্রেমে পড়ে গেলাম। পুরনো গান নতুন ম াত্রা পেল কিঙ্করদার গলায়।
কিঙ্করদা কীভাবে যেন বুঝে গিয়েছিলেন, ওঁর চেয়ে বয়সে বাইশ বছরের ছোট হলেও, অমি ওঁর প্রাণের দোসর, আত্মার আত্মীয়। তাই যখন - তখন আমার কাছে ছুটে আসতেন এই আপনভোলা মানুষটি। পরে অবশ্য উনি যে কটা দিন কাংড় ায় ছিলেন আমার কোয়ার্টারেই পাকাপাকি আস্তানা গেড়েছিলেন।
জাত - নেশুড়ে বলতে যা বোঝায় কিঙ্করদা ছিলেন ঠিক তাই। একটু বেশি মাত্রায়ই বোধ হয় মদ্যপান করতেন, কোন প্রক ার মদে তাঁর কোন রকম জাতবিচার ছিলনা--- মহুয়া - হাড়িয়া - চুল্লু- চোলাই- কালীমার্কা - ভদকা- রাম- হুইস্কি কোন কিছুতেই ওঁর আপত্তি ছিল না। কড়া মদে আসক্তি থাকলেও, কোনোদিন কিঙ্করদাকে আমি মাতাল হতে দেখিনি। একটু-অ াধটু পান করেই আমরা চেঁচামেটি করি, আর উনি পিপে-পিপে গিলেও চুপচাপ। আমরা যত না খাই, বাজনা বাজাই বেশি। উনি যতই খান, বুঁদ হয়ে যান।
একদিন পাহাড় থেকে ফিরে কিঙ্করদা আমাকে ডেকে বললেন, নেহেজি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তা সবই শেষ হয়ে গেছে। ওঁকে লিখে দাও অবিলম্বে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাতে। যে শ্রমিকেরা প াথর কাটছে তারা বড়ই গরিব। টাকার অভাবে তাদের মজুরি দিতে পারছিনা।
আমি সেদিনই পোস্টমাস্টারের সঙ্গে এ - নিয়ে কথা বলি। ফি-মাসে মাইনে পাবার পর বাড়িতে টাকা পাঠাবার জন্য ওখ ানে আমাকে যেতে হয়। সেই সুবাদে পোস্টমাস্টার আমার পরিচিত। এঁর কথামত পরদিন একটা ড্রাফট করে, তার সঙ্গে কিঙ্করদার একটা চিঠি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠিয়ে দিলাম পোস্টে।
তিনদিন পরই স্বয়ং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সদলবলে কাংড়ায় হাজির। পাথর কাটার মজুরেরা পাওনা টাকা পেয়ে গেল। ওদের মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু কিঙ্করদার মুখের হাসি উবে গেল। উনি আর এক সাংঘাতিক সমস্যায় পড়লেন। পাহাড় ব্ল াস্ট করে পাথর বার করা হচ্ছে বটে, কিন্তু পাহাড়ি মজুরদের অপটু হাতে যে পাথর বেরিয়ে আসছে তা ঠিক মাপসই হচ্ছেনা। আট কিউবিক ফুট না হয়ে তা আগেই চিড় খেয়ে ভেঙে পাঁচ-ছ ফুট আকার নিচ্ছে। সে - পাথর দিয়ে মূর্তি নির্ম াণ করা যাবেনা। থমথমে মুখে কিঙ্করদা আবার আমাকে ডেকে বললেন, আমি একজন আর্টিস্ট, কন্ট্রাক্টর তো নই। নেহেজিকে লিখে দাও। আমার মজুরেরা পাথর কাটার কায়দা - কানুন ঠিক মত জানেনা, জুৎসই পাথর পাহাড় থেকে কেটে আনতে পারছেনা।
সমস্যার কথা জানিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে চিঠি পাঠালাম। চিঠি পাওয়ামাত্র নেহেজি পাথর কাটার বিশেষ প ারঙ্গম একজন এঞ্জিনিয়ারকে কাংড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রযুক্তির প্রয়োগ- কৌশলে পটু সেই এঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে সেই পাহাড়ি মজুরেরাই আট কিউবিক ফুটের ছটি পাথর পাহাড় কেটে বার করে দিল।
প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাথর পেয়ে কিঙ্করদা মহা খুশি। কয়েদিনের মধ্যেই পাথর নিয়ে কিঙ্করদা দিল্লি যাত্রা করলেন। কিন্তু এ

কমাসের সান্নিধ্যে তিনি আমাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করে গেলেন।

ছুটির অবকাশে দিন কয়েক পরে আমি দিল্লি হাজির হয়ে গেলাম কিঙ্করদার কাছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে রাস্তার ওপর কিঙ্করদা তখন কাজ করে চলছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে থাকার ঘর দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নেননি। তাঁর শিষ্যএবং ঐ কাজের সহযোগী শঙ্খ চৌধুরি পর্যন্ত অনুরোধ করেও তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে পারেননি। যতদিন না কাজ শেষ হয়, রাস্তাই হয়ে উঠেছে তাঁর ঘরবাড়ি। আসলে কি, খাঁটি মাটির মানুষবলতে যা বোঝায় আক্ষরিক অর্থে কিঙ্করদা ছিলেন তা-ই। বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে চোদ্দ - পনেরো বছরের যে কিশোরটিকে একদিন এনে ফেলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের অভিজাত্যের ঘেরাটোপে, প্রাণপণ তিনি চেষ্টা করেছিলেন সেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে--- শান্তিনিকেতনি আদব - কায়দা শিখতে। গুদেব রবীন্দ্রনাথ মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর স্নেহ - ভালোবাসাও জুটেছিল তাঁর, তথাপি ভেতরের গেঁয়ো মানুষটিকেও পুরোপুরি বর্জন করে রেখে আসতে পারেননি বাঁকুড়ার গাঁয়ে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের এক বৃহদাংশ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। পরবর্তীকালে কলাভবনের শিক্ষক হিসেবেও ঋিভারতীয় আঙিনায় তাঁর ঠাই হয়নি। এজন্য অবশ্য তাঁর কোন মাথাব্যথাও ছিলনা। প্রথমদিকে কাটিয়েছিলেন আশ্রমের পূর্বদিকে শৈলদির বাড়িরএকটি ঘরে। পরের এখনকার সংগীতভবনের সামনে অস্পৃশ্য জমাদারদের পরিত্যক্ত মাটির ঘরে কাটিয়েছেন অনেককাল। ওখানে থাকাকালীন গোটা সময়টাই তাঁর কেটেছিল বুঝি সৃষ্টিসুখের উল্লাসে । ওখানেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর মহত্তম সৃষ্টি সাঁওতাল দম্পতি--- সিল্কের ওপর জুতোর ব্রাশ দিয়ে আঁকা। আর পোলি পটভূমিতে গর গাড়ি, যার নামকরণ করেছিলেন তিনি কোনার্কের পথে। কিঙ্করদার তেলরঙা কাজের সূত্রপাতও এখান থেকেই। আমাকে তিনি যে বিনোদিনী-র ভার্স্কর্যটি উপহার দিয়েছিলেন সিমেন্ট কংক্রিটে গড়া, যায় কথা কিছু পরে বিস্তারিত বলেছি, সেটিও নির্মাণ করেছিলেন ওখানে বসে। এসব কথা এজন্যই বলা যে বারবারই শ্যামল মাটির বাসা-য় তিনি সচ্ছন্দ বোধ করতেন। কংক্রিটের খাঁচায় তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। কাঠ - ফাটা রোদে টোকা মাথায় খোলা মাঠে ছেনি - হাতুড়ি হাতে কাজ পাগল কিঙ্করদার চেহারাটা যেন চোখের সামনে আজো ভেসে ওঠে। বড় আকারের ভার্স্কর্য গড়ার উপযুক্ত স্টুডিও তখন কলাভবনে ছিল না এটা যেমন সত্য তেমনি এটাও সত্য যে, না থাকার কারণে বসে থাকার পাত্রও ছিলেন না কিঙ্করদা। তিনি খোলা আকাশের নীচে সিমেন্ট - কংক্রিটের বড় বড় কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং খোলা আকাশের নীচে দিল্লির রাস্তায় বসেই তিনি যে যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি গড়বেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।

যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি-নির্মাণ শেষ করে কিঙ্করদা এক সময় শান্তিনিকেতন পাড়ি দিলেন।

বেশ কিছুকাল পর আমাকে একবার শান্তিনিকেতন যেতে হয়েছিল, কলাভবনে একটি শূন্যপদে প্রার্থী হয়ে। শান্তিনিকেতন পৌঁছে ভাবি, এখানে যখন এসেই গেছি তখন একবার কিঙ্করদার সঙ্গে দেখা করে যাই। কতকাল দেখা হয়না। এখানকার কাজটা যদি জুটে যায় তবে তো এখানে একটা থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সে - ব্যাপারে কিঙ্করদার কাছে গেলে নিশ্চয় খানাপিনা ভালোই হবে।

কিঙ্করদার ডেরায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই স্বভাবসিদ্ধ হো- হো হাসতে হাসতে উনি বলে উঠলেন, এই যে ভূত তুই এসে গেছিস, তোকে এখন কোথায় বসতে দিই, কিবা খেতে দিই--- নিজেরই তিনদিন পেটে ভাত পড়েনি।

তখনই সাইকেল রিক্সা ডেকে কিঙ্করদাকে কালোর দোকানে নিয়ে গেলাম। উনি তিনদিনের খাওয়া একদিনেই খেয়ে নিলেন।

কিঙ্করদা বিয়ে-থা করেননি। ঘরে একাই থাকতেন। উপবাসের কথা লজ্জায় বোধহয় কাউকে বলতে পারেননি, কেউ যেচে এসে খোঁজও নেননি।

সেদিনই ইন্টারভিউ-ফেরৎ যখন কিঙ্করদার কাছে আবার গেলাম কিঙ্করদা সিমেন্ট-কংক্রিটে গড়া বিনোদিনী-র একটি মূর্তি দেখিয়ে বললেন, একটা তুই সঙ্গে নিয়ে যা।

কিঙ্করদার দেওয়া সেই ভার্স্কর্যটি পরে আমি ব্রঞ্জে রূপান্তরিত করে নিই। বহুকাল আমি সেই মূর্তিটি আমার সংগ্রহে স্মৃতি হিসেবে সযত্নে রক্ষা করি। ঐ-শিল্পনিদর্শনটি ছিল আমার কাছে এক মহার্ঘ সম্পদ। শুনেছি বিনোদিনী ছিলেন মণিপুরের রাজকন্যা। শান্তিনিকেতন কলাভবনে চিত্রকলা শিক্ষা করতে এসেছিলেন। রামকিঙ্কররের শিল্পকর্মে গুণমুগ্ধ এই রাজকন্যা প্র

ায়ই চলে আসতেন কিঙ্করদার মাটির ঘরে। প্রথমে ছবিতে, পরে সিমেন্ট - কংক্রিটেরক ভাস্কর্যে সেই মেয়েটিকেই ধরে রেখেছিলেন কিঙ্করদা। সারাজীবন সৃষ্টির নশায় কাজ করে গেছেন উনি। কি পেয়েছেন তার হিসেব - নিকেশ করেননি কোন দিন। মূর্তি - নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, কুছ পরোয়া নেই। সিমেন্ট - কংক্রিট দিয়েই মূতি নির্মাণ করেছেন। কিংবা স্রেফ মাটি দিয়েই মূর্তি গড়ে , শেষে পুড়িয়ে শক্তপোক্ত করে নিয়েছেন। হাতের কাছে যা সহজলভ্য তা দিয়ে রেখে গেছেন অনুপম শিল্পের স্বাক্ষর।

শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করই সর্বপ্রথম ব্রঞ্জের পরিবর্তে সিমেন্ট- কংক্রিটে মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় মাস্টারমাশাই নন্দলালের সাহচর্যে অনেক বিষয়েই তিনি নতুন করে ভাবতে শিখেছিলেন। প্লাস্টারর অব প্যারিসের বিকল্প হিসাবে কুমোর মাটি দিয়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্য, গোবরমাটি আর আলকাতরার মিশেলে দেয়ালে বড় রিলিফের কাজ -- এমন কতশত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না তিনি করেছেন কলাভবনে বসে।

রামকিঙ্করের সমস্ত কাজেই একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যেত। এটা নেই ওটা নেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার লোক তিনি ছিলেন না।

একদিন এঁর ডেরায় গিয়ে দেখি একটা ক্যানভাসে ছবি আঁকার পর হাতের কাছে আর কোন ক্যানভ্যাস নেই। অথচ মুড এসে গেছে আরো ছবি আঁকার। উনি করবেন কি, আঁকা ক্যানভাসের অপর দিকেই ছবি আঁকা শু করে দিলেন। প্রচলিত শিল্পোপকরণের ঘাটতি তিনি মিটিয়ে দিতেন নিজ-উদ্ভাবিত শিল্পোপকরণ দিয়ে। রামকিঙ্কর অয়েলপেন্টিং -এ দেখেছি সাঁওতালদের দোসুতি চাদর ফ্রেমে এঁটে, একটা টেবিলকে প্যানেল বানিয়ে, বাজারে কেনা রঙ তিসির তেলে গুলে দিব্যি কাজ চালিয়ে গেছেন।

রিয়ালিস্টিক ড্রায়িং -এ ওস্তাদ ছিলেন রামকিঙ্কর। অন্যদিকে ভাস্কর্য শিল্পেও তিনি ছিলেন আধুনিকতার দিশারী। শিল্পগু নন্দলাল বসু পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, কিন্তু তাঁর শিষ্য রামকিঙ্কর শান্তিনিকেতনের পরিবেশে মানুষ হলেও ঐ-ধরনের কোন ছুৎমার্গের শিকার হননি কখনো। অনায়াসে পাশ্চাত্য শিল্পকলাকে তিনি আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিলেন। ভারতে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত শিল্পের জনক ছিলেন তিনি। তাঁর এই উদার মনোভাব তিনি লাভ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ভাবনা কবির মনে এসেছিল বসুধাকে কুটুম্বজ্ঞান করেই, আর সেই ভাবনাকে বাস্তব রূপদান করার জন্য শিল্পাঙ্গনে রামকিঙ্করের মত শিল্পী-ভাস্করের প্রয়োজন ছিল, যিনি বঙ্গীয় শিল্পকলাকে পৌঁছে দিতে পারেন আন্তর্জাতিক শিল্পকলার দোরগোড়ায়। রবীন্দ্র-প্রশ্রয়েই রামকিঙ্করের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কলাভবনে একের পর এক বিমূর্ত ভাস্কর্য রচনা করা এবং বাস্তবধর্মী ছবির চিত্রণ।

এতো গেল একজন শিল্পীর চিত্ররচনার রীতি প্রকরণের কথা। কিন্তু যে- কথা না বললে একজন মহৎ শিল্পীর মহত্ত্বের কথা অকথিত থেকে যাবে তা হল নিজের শিল্পকর্মের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি--- যা তাঁকে সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এবার আমরা অনেকটাই অপরিচিত রামকিঙ্করের সেই সংহারের শিবমূর্তিটি দেখাতে চাইব, তঁারই প্রিয় শিষ্য শঙ্খ চৌধুরি জবানিতে একবার কিঙ্করদা গুদেবের পোর্ট্রেট করবেন বলে মাস্টারমশাই-এর অনুমতি নিয়ে মাটি, মশলা-সমেত উত্তরায়ণে ওঁর বসার জায়গায় এলেন। পাছে ঘর ময়লা হয় সেই ভয়ে কিঙ্করদা জানালার বাইরে মডেলিং স্ট্যাণ্ড নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। আমরা অর্থাৎ আমি আর প্রভাস সেন ওঁর জোগানদার। কিঙ্করদা গুদেবের দুইহাতসুদ্ধ কোমর পর্যন্ত বিরাটকায় মূর্তি করলেন। আমরা মহোৎসাহে ওটাকে স্টুডিয়োয় আনি। অনেক কাণ্ডকারখানা করে ওর ছাঁচ নেওয়া হল। এরআগে এত বড়ো কাজের মোলডার ছাঁচ নেওয়া হয়নি। কিঙ্করদার বড়ো কাজ সবই ডাইরেক্ট সিমেন্ট- কংক্রিটে করা। মাস্টারমশাই কাজটা দেখে মহা খুশি বললেন, ওটা ঢালাই হয়ে গেলে কারমারকার -দের দিয়ে ওটা শ্বেতপাথরে করাবেন। আমরা তো বীর যোদ্ধার মতো খেটেখুটে শুতে গেলাম। পরদিন দেখি স্টুডিয়ো বন্ধ, অার ভিতর থেকে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে। দরজা ধাক্কা দিলাম। কিঙ্করদা দরজাটা একটু ফাঁক করে আমায় কোন কথা বলতে মানা করে ভেতরে ঢুকতে বললেন। গিয়ে সত্যিই হতভম্ব হয়ে গেলাম। উনি নিজে একটা হাতুড়ি দিয়ে নির্মমভাবে প্লাস্টারেরমূর্তিটা ভাঙছেন। বাগাল (স্টুডিয়োয় মাটি তৈরি করত) ঝুড়ি করে স্টুডিয়োর বাইরে একটা গর্ত খুঁড়ে ওগুলো পুঁতেদিচ্ছে। কোন কথা বলা যাবে না। আমি তো মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম (স্মৃতি-বিস্মৃতি, শঙ্খ চৌধুরি, পৃ ২৯-৩০)

তাঁর নিবিড় সঙ্গ দোষেই কিনা জানিনা, আপন সৃষ্টির প্রতি রামকিঙ্করের নিরাসক্ত মনোভাব এই অধম শিল্পী অলাচৌ তথা

অমরেন্দ্রলালা চৌধুরির ওপরও কিছু পরিমাণে বর্তেছিল বৈকি। আমার ছবি নিয়ে কখনো যদি পূর্বাপর প্রদর্শনী হয় তবে লক্ষ্য করবেন আমি দীর্ঘকাল ধরে একই বিষয় নিয়ে একই আঙ্গিকে কোনদিন ছবি আঁকিনি। এককালে আমি মেতে উঠেছিলাম কিউবিজিমে। আমার চোখের মণি ছিলেন তখন পাবলো পিকাসো। তারপর একটা সময় আমার ছবিতে ভাস্কর্যের প্রভাব, পরেও যা অনেক কাল আমাতে ভর করেছিল, এরপর এক সময় সুক্ষ্ম রেখার সাহায্যে নারীশরীরের রহস্য ভেদ করতে চেয়েছিলাম। আমার রেখায়-লেখায় ফুটে উঠত ভঙ্গে - বিভঙ্গে বিভিন্ন নারী-- তারা কেউ মদালসা, কেউ কামিনী, কেউ বা চকিতা হরিণী । তারপর এল অর্কিড নিয়ে খেলা। গুল্মলতার পাতায় ফুলে লাগল পাটরির ছোঁয়া। মাঝে এমনও হয়েছে দীর্ঘ --- দীর্ঘকাল নিজেকে ছবি আঁকার কাজ থেকে সরিয়ে রেখেছি। কেন জানেন ? মনে হচ্ছিল বুঝি নিজেকেই নিজে নকল করে চলেছি। অসন্তোষ তীব্র অসন্তোষ মনের মধ্যে তখন হেলাফেলা সারাবেলা/ একি খেলা আপন - মনে। আবারো রঙ-তুলি নিয়ে বসি। রঙের খেলায় এবার মেতে উঠি। আজো অসুস্থ অবস্থায় ঘরবন্দি হয়ে রঙের খেলায় মেতে আছি।

অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে এবং কোন একটি বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োগে যখন জনপ্রিয় হন এবং বাজার পেয়ে যান, তখন তিনি নিজের তৈরি গন্ডি থেকে নিজেই বেরিয়ে আসতে পারেননা। কখনো বা পারলেও, চাননা। নিজের শিল্পীসত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খান--- এগিয়ে যেতে পারেননা।

একই ছবির পুনরাবর্তনে তাঁর মনে হয়তো কোন গ্লানি নেই, কিন্তু আমার আছে। আপন সৃষ্টি নিয়ে অসন্তোষের জ্বালায় দগ্ধ হয়ে যখনই রঙ - তুলি ক্যানভাস সরিয়ে রেখে চুপচাপ বসে থেকেছি তখনই শঙ্খ চৌধুরি - বর্ণিত রামকিঙ্কর--- আমার প্রিয়সখা কিঙ্করদা, হেঁড়ে গলায় গেয়ে ওঠেন আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয় / সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।...

চিত্রকল্পকথা থেকে সংগ্রীহিত